তারিখ 12
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা

শি ক্ষা

হায়দার আকবর খান রনো

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা এবং হেফাজতের কাছে সরকারের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম গত ১৮ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়*। এরপর ২৮ জানুয়ারি *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়েছে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ দেওয়া হেফাজতের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য। তাঁরা খোলামেলাই বলেছেন, ১৭টি 'অনৈসলামিক কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনি এবং মেয়েদের জন্য আপত্তিকর এমন রচনা ও ছবি' বাদ দিতে হবে। তাঁরা দাবি করেছেন, বোর্ড প্রথমে রাজি হয়নি, তখন বোর্ডের কর্মকর্তাদের 'মাথা ডিঙিয়ে সরকারের আরও বড় কর্তাদের' কাছে তাঁরা ধরনা দেন। তাতে কাজ হয়েছিল।

গত বছর ৮ এপ্রিল হেফাজতের ২১ কেন্দ্রীয় নেতা যৌথ বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, 'বর্তমান স্কুল পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের নাস্তিক্যবাদ ও হিন্দুতত্ত্বের পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে।' এই অভিযোগ এনে তাঁরা ১৭টি লেখা বাদ দেওয়া এবং ১২টি লেখা যুক্ত করতে বলেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিয়ে এই বছরের পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছিল। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুটি পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার পর জাতীয় পাঠ্যক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) নজরে আসে যে হেফাজতের দাবি অনুসারে দুটি লেখা এখনো বাদ পড়েনি। তত দিনে প্রায় ১৫ লাখ বই ছাপা হয়ে গেছে। সেগুলো বাতিল করে হেফাজতের দাবির এক শ ভাগ মেনে নতুন করে ছাপানো হয়। এ জন্য হেফাজত সরকারের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

পাঠ্যবই নিয়ে হেফাজতের সন্তোষ আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। এই হেফাজতের প্রধান একদা নারীবিদ্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত সমালোচনা করেছিলেন। সেটা ২০১৩ সালের কথা। মাত্র তিন-চার বছরে এত পরিবর্তন কী করে হলো, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। পাঠ্যপুস্তকে এই পরিবর্তন ও সাম্প্রদায়িকীকরণ কীভাবে হলো, কারা এই কাজ করলেন, কার হুকুমে হয়েছে, তা এখনো জানা গেল না। গত ১৯ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক রচনায় দায়প্রাপ্ত ১৩ জন সংকলক-সম্পাদক যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, পাঠ্যপুস্তকের এসব পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি অজ্ঞাত। পরিবর্তন সম্পর্কে সংকলক-সম্পাদকদের কিছুই জানানো হয়নি।

সাধারণত নিয়ম হচ্ছে, বানান ভুলের মতো ছোটখাটো ভুলের জন্য এনসিসিসির বিশেষজ্ঞরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু কোনো লেখা বাদ দেওয়া বা যুক্ত করার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) অনুমোদন এবং সম্পাদকদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, হেফাজতের নেতারা *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর কাছে বলেছেন, এনসিটিবি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বাদ দিতে হবে, কারণ তিনি হিন্দু। তাঁদের ভাষায়, 'কেন, আমাদের দেশে কি দেশপ্রেমিক কোনো মুসলমান নেই, যিনি টেক্সট বুক বোর্ডের প্রধান হতে পারেন?'

সরাসরি এমন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য কি আমাদের সংবিধানপরিপন্থী নয়?

পাকিস্তানি ভাবাদর্শকে খণ্ডন করেই আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং বিজয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানি ভাবধারা যদি আবার ফিরে আসে; বিশেষ করে শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে, তাহলে আমাদের অর্জিত বিজয়ও যে হারিয়ে যাবে, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

প্রগতিশীল লেখক রণেশ দাশগুপ্তের লেখা 'মাল্যদান' রচনাটি বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছে হেফাজত। কেন, তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। হেফাজতের পাকিস্তানপ্রীতি ও পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রতি একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যাবে। বাদ দেওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, রণেশ দাশগুপ্ত তাদের চোখে মাত্র একজন হিন্দু। দ্বিতীয়ত, 'মাল্যদান' রচনার বিষয়বস্তু। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশজুড়ে সংঘটিত হয়েছিল ব্যাপক গণহত্যা, যার সাক্ষী হিসেবে এখনো রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বধ্যভূমিতে 'মাল্যদান' নিয়ে রচিত এই লেখা। এই রচনা পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানবে কীভাবে পাকিস্তানি সেনারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং একই সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি। জামায়াত ছিল সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর এবং গণহত্যায় অংশগ্রহণকারী। এ কারণে দলটির মূল নেতারা বিচারের মুখোমুখি হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। হেফাজতের নেতারাও চান না যে পাকিস্তানিদের বর্বরতা ও নৃশংসতার কথা ছাত্রছাত্রীদের জানানো হোক। যে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে হেফাজত গঠিত, সেখানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। তাদেরই দেওয়া ভাষ্য অনুসারে পঞ্চম শ্রেণির ঊর্ধ্বে বাংলা পর্যন্ত পড়ানো হয় না। এখন দেখা যাচ্ছে জামায়াত হলো মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির জোটসঙ্গী। আর প্রায় একই ভাবাদর্শের হেফাজত সম্প্রতি হয়ে উঠেছে শাসকদল আওয়ামী লীগের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দল, যাদের পাঠ্যপুস্তক-সংক্রান্ত নীতির সবটাই সরকার মেনে নিয়েছে। জামায়াত খুন করেছিল মানুষ। এরা ধ্বংস করতে চায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শকে। হেফাজতও সেই পথেই হাঁটছে।

যেসব দাবি হেফাজত করেছে, যা সরকার পালন করেছে, তা আসলে পাকিস্তানি ভাবাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সে জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের অন্য নেতারা কেবল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অস্বীকৃতি জানাননি, তাঁদের অনেকেই বাংলা ভাষাকে তথাকথিত 'ইসলামীকরণের' প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। রোমান হরফে বা আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবও এসেছিল। রবীন্দ্রসংগীত রেডিও-টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁদের এত বড় স্পর্ধা ছিল যে তাঁরা কবি নজরুল ও জসীমউদ্‌দীনের কবিতাকেও পরিবর্তন করেছিলেন তথাকথিত 'ইসলামীকরণের প্রয়োজনে'। পাকিস্তান আমলের সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'হেফাজতকে রাজনৈতিকভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটা ভোটের রাজনীতির অংশ। তবে এই আপসকামিতা কারও জন্য সুখকর হবে না। পাকিস্তান আমলে মোনায়েম খানের সময় পাঠ্যবইয়ে জসীমউদ্‌দীনের "নিমন্ত্রণ" কবিতাটিকে "দাওয়াত", নজরুল ইসলামের "মহাশ্মশান" শব্দটিকে "গোরস্থান" করা হয়েছিল। এরপর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়। সেই দেশে আজ যা চলছে, তা অকল্পনীয়, বিস্ময়কর।'

যে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর প্রতিবেদনের কথা দিয়ে এই লেখা শুরু হয়েছে, সেখান থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। *নিউইয়র্ক টাইমস* লিখেছে, হেফাজত এরপর শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ছবি আঁকার পাঠ তুলে দিতে চায়। কারণ, ধর্মে মানুষের ছবি আঁকা মানা। শরীরচর্চা-বিষয়ক কোনো পাঠে যদি মেয়েদের ছবি থাকে, তা-ও বদলাতে হবে।

হেফাজত পাঠ্যপুস্তক থেকে যেসব কবিতা বা গদ্য বাদ দিতে বলেছে, তা মেনে নেওয়া মানে ধর্মান্ধতা, হিন্দুবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেওয়া। কোনো কবিতা বা লেখা কেন বাদ দেওয়া হবে, তা-ও তারা ব্যাখ্যা করেছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতাটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। কারণ, ওই কবিতায় নাকি নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ ধর্মগ্রন্থকে কটাক্ষ করেছেন। অথচ এটি খুবই উৎকৃষ্ট কবিতা। তাই এমন অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। ওয়াজেদ আলীর 'রাচী ভ্রমণ' বাদ দিতে হবে। কারণ, রাচী ভারতে অবস্থিত ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। সত্যেন সেনের 'লাল গরু'টা বাদ দিতে হবে। কারণ, তাতে গরুকে মায়ের মতো উল্লেখ করে হিন্দুত্ব শেখানো হয়েছে। একইভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল ঘোড়া' গল্পটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। কারণ, তা পশুর প্রতি দরদ তৈরি করে, যা পশু কোরবানির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। কারণ, তাতে ফুলকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে; যা নাকি ইসলামের নীতিবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

হেফাজতের দাবি ও কুযুক্তির তালিকা আরও বড়। সবটা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা' বাদ দিতে চেয়েছে। কারণটি ব্যাখ্যা করা না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি শ্রমিক আন্দোলনের মহান দিবস—মে দিবস তাদের মতো প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে অপছন্দনীয় ও ভীতিকর। তারা যে কমিউনিস্টবিদ্বেষী, তার প্রমাণ তো পাওয়া গেছে যখন ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজত কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে আগুন দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যের দিকপালের রচনাও বাদ দেওয়ার মতো ঔদ্ধত্য হেফাজত দেখিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও উদ্বেগের কথা হলো এই, সরকার তা মেনে নিয়েছে। এ নিয়ে এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোনো কারণ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি।

পদ্মা সেতু নির্মাণ আমাদের সাফল্য। কিন্তু পদ্মার পানি শুকিয়ে গেলে সেই সাফল্য ম্লান হয়ে যায়। গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন হচ্ছে বলে আনন্দ করা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে যদি ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তেমনি স্কুলপর্যায়ে জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ির গল্প শুনিয়ে শিক্ষামন্ত্রী গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু সবটাই অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় পরিণত হবে, যদি এভাবে হেফাজতের দাবি মেনে সাম্প্রদায়িকতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেওয়া হয় পাঠ্যপুস্তকে ও কোমলমতি শিশুদের মগজে। এটি নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করার বিরাট ষড়যন্ত্র বলেই আমরা মনে করব। সরকারকে বলব, এখনই পদক্ষেপ নিন, শিক্ষাকে অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলুন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সেই শিক্ষা যদি কুশিক্ষা হয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়?

● **হায়দার আকবর খান রনো: রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।**